সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিজ্ঞান, উচ্চতর গণি, উচ্চতর গবেষণা ইত্যাদির সুযোগ থেকে মেয়েদেরকে বঞ্চিত করলে মেয়েদের যতটুকু ক্ষতি হবে, তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি ক্ষতি হবে সমাজের এবং সৃষ্টির। প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে কমিশন অবশ্য উদারনীতি পোষণ করেছে। প্রয়োজনে এক মাইলেরও কম দূরত্বের ভিতরে মেয়েদের জন্য প্রাথমিক স্কুল স্থাপনের সুপারিশ করেছে।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৮

এ কমিশন মফিজউদ্দিন কমিশন নামে খ্যাত। এর নেতৃত্বে ছিলেন উপাচার্য মফিজ উদ্দিন আহমেদ। ১৯৮৭ সালে এ কমিশন গঠিত হয় এবং ১৯৮৮ সালে রিপোর্ট পেশ করে। মফিজউদ্দিন কমিশন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও এতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের অংশ গ্রহণকেও তাৎপর্যময় করে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করে। নারীশিক্ষা সম্প্রসারণ ও কার্যকর করার জন্য কমিশনের সুপারিশগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। কমিশন প্রাথমিক থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সুপারিশ করে। প্রয়োজন হলে অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করে ছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার কথা বলে। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভে উৎসাহ ও সুযোগ বৃদ্ধি করে অদূর ভবিষ্যতে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেও সুপারিশ করা হয়। কমিশনের এ সুপারিশটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মেয়েদের নিজ পায়ে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে কমিশন তাদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুপারিশ করে এবং মেয়েদের জন্য অধিক সংখ্যক চাকরির সুযোগ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছে যাতে তারা পড়াশুনায় উৎসাহ বোধ করে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে অধিক সংখ্যক মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ওপর এ কমিশন গুরুত্ব আরোপ করে।

চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি, আইন প্রভৃতি পেশাগত শিক্ষায় ক্রমবর্ধমান ছাত্রী ভর্তির লক্ষ্য নিয়ে যাতে আরও অধিক সংখ্যক মেয়ে এ সকল বিষয়ে পড়াশুনার সুযোগ পায় সে উদ্দেশে তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং অধিক পরিমাণ বৃত্তির ব্যবস্থা করা উচিত বলে কমিশন মত প্রকাশ করে। এ রিপোর্ট অনুযায়ী বলা যায় যে, একমাত্র এই কমিশনই যথার্থ নারী শিক্ষায় অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

১৯৭৮ সালে তৎকালীন সরকারের আমলে শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে সর্বদা নারীকে ঘিরে রাখা হয়েছে। নারীশিক্ষাকে শুধু পরিবারের মঙ্গল, শিশু-যত্ন ও ঘর-কন্নার কাজে সীমাবদ্ধ রেখে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেককে জাতীয় উন্নয়নে নিষ্ক্রিয় রাখা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রবণতা দূর করতে হবে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অসামান্য অবদান রেখেছেন। স্বাধীনতার পর থেকে নারী ক্রমে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে, জাতীয় উৎপাদনে অংশগ্রহণ, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা সচেতন হয়ে ওঠে। তাই নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার।

নারীশিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবার গঠন, যৌতুক ও নারী নির্যাতন রোধ করা। যতদিন পর্যন্ত না শিক্ষার মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটবে ততদিন পর্যন্ত সমাজ থেকেও নারী নির্যাতন কমবে না বলে মত দেয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কমিটির যে সুপারিশগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে এ স্তরের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সমনাগরিকত্ব বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাক্রম তৈরি করা, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা, শিশু অধিকার সনদ, সিডো, নাইরোবি ফরওয়ার্ড লুকিং স্ট্র্যাটেজি, বেইজিং প্লাটফরম ফর একশন, স্থানীয় সরকার পরিষদ, জাতীয় সরকারের ভূমিকা, মৌলিক অধিকার, জাতীয় উন্নয়ন নীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় মেয়েদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্কুলে অধিকতর গবেষণাগার স্থাপনা করা। উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশগুলো প্রশংসার দাবি রাখে। ইতোপূর্বে কোন কমিটির সুপারিশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টিকে এভাবে বিবেচনায় আনা হয়নি। কেবল মফিজউদ্দিন কমিশন রিপোর্টে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমেন্স স্টাডিজ নামে আলাদা বিভাগ খোলার সুপারিশ করে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খোলা হয়েছে। এছাড়াও কমিটি সিডো সনদের বাস্তবায়নের জমতিয়েনে 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে বাংলাদেশও অংশগ্রহণ করে। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশেও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ আইন ১৯৯০ সালে প্রণীত হয় এবং ১৯৯২ সালে আংশিকভাবে এবং তার পরের বছর থেকে সারা দেশে এ আইন প্রবর্তন শুরু হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি, অধিক সংখ্যায় মহিলা শিক্ষক নিয়োগ, বিনামূল্যে বইপত্র প্রদান, বিনা বেতনে শিক্ষা, বিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ আরও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বইপত্রগুলোতে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্য দূর করে সমতা বিধানের চেষ্টা করা হয়। ঠিক একইভাবে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ভর্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। স্কুল-কলেজগুলোতে মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থার ফলে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ছাত্রী সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় বেড়েছে। স্কুলের পরিবেশগত উন্নয়নের লক্ষ্যে টিউবওয়েল ও মেয়েদের জন্য পৃথক ল্যাট্রিন স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক স্কুলশেষে মেয়েদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তাদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে সরকার যথেষ্ট সজাগ এবং সচেতন।

এ ব্যাপারে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। এক নজরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থান লক্ষ করলে যে চিত্র পাওয়া যায় তা খুব হতাশাব্যঞ্জক নয়।

নারীশিক্ষা ব্যতিত উন্নত সমাজ নির্মান সম্ভব নয়। যেখানে সমাজের অর্ধেকই নারী তাদের বাদ দিয়ে উন্নত জাতি, উন্নত সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। পরিশেষে শুধু বলতে চাই, কেবল সেমিনার আর কথার মধ্যে বৃত্তবন্দি না থেকে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য আমাদের সবাইকে যুগের চাহিদা পূরণের বাস্তবতার নিরিখে অগ্রসর হতে হবে, তবেই দেশ ও জাতি তার কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌছাতে পারবে।

লেখক : প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কুল এন্ড কলেজ

তথ্যসূত্র : শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-১৯৭৪

[সাক্ষরতা বুলেটিন, শ্রাবণ ১৪১৬, জুলাই ২০০৯]